Compiled and circulated by

Dr. Bhakti Pada Jana

SACT (Grade II), Department of History, Narajole Raj College

ইক্তা ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ ?

ভূমিকা

দিল্লী সুলতানী আমলে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল ইক্তা ব্যবস্থা । সুলতান ইলতুৎমিস প্রথম ইক্তা ব্যবস্থা প্রচলন করেন। ইক্তা ব্যবস্থা দু প্রকারের। 'ইকতা-ই-তামসিক এবং ইকতা-ই-ইস্তিকলাল। প্রথমোক্ত ইকতা বলতে ভূমি বোঝাতো। দ্বিতীয় ইক্তা বলতে শাসক কর্তৃক ব্যাক্তি বিশেষকে অর্থ মঞ্জরি বোঝায়। তবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেনীর ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইক্তা গ্রহীতার খেতাব ছিল মাক্‌তি। প্রজারা প্রদেয় রাজস্বের শোধের পর তাদের সম্পত্তির উপর মাকতির কোনো অধিকার থাকতনা । নিজাম-উল-মুলকের মতে, ইক্তাদার সুলতানের ইচ্ছার উপর পদে থাকতেন।

সুলতানি আমলে প্রদেশের সংখ্যা ছিল ২০ থেকে ২৫। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই সমস্ত প্রদেশকে ইক্তা বলে অভিহিত করেছেন। ইক্তা আবার দু ধরনের ছিল - ছোট ও বড় । ছোট ইক্তা গুলিকে সামরিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতে হত। আবার বড় ইক্তাগুলিকে প্রশাসনিক দায়িত্বপালন করতে হত এবং আদায়ী রাজস্ব প্রশাসনিক ব্যয় করার পর সুলতানকে প্রেরণ করতে হত। ইক্তার শাসককে বলা হত মুক্তি, যদিও প্রধান শাসক ছিলেন সুলতান। মুক্তি হলেন এক সামরিক নেতা যার কাজ রাজস্ব আদায় করা ।

ইলতুৎমিস ও ইক্তা ব্যবস্থা

সুলতানি পর্বে বিভিন্ন সময় ইক্তা ব্যবস্থার পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। কুতুব উদ্দিন আইবক ও ইলতুৎমিস ইক্তাদারী প্রথার মাধ্যমেই তুর্কী আধিপত্য উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার করেন । ইলতুৎমিস দিল্লি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল এবং দোয়াব নিজ খলিসা জমি হিসেবে রাখেন এবং অবশিষ্ট অঞ্চল তিনি ইক্তাদারের মাধ্যমে সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহন করেন ।

বলবন ও ইক্তা ব্যবস্থা

সুলতান বলবন ইক্তা ব্যবস্থায় নানাবিধ দুনীর্তি দূর করার জন্য সামরিক সংস্কারের প্রয়োজন বোধ করেন । তিনি ভেবেছিলেন যে যদি রাষ্ট্র সঠিকভাবে সেনাবাহিনীর সাহায্য না পায় এবং ইক্তার উদ্বৃত্ত রাজস্ব না পায় তাহলে রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়বে । একারণে বলবন যে সকল মুক্তি রাষ্ট্র কর্তৃক ভাতা ও জমি ভোগ করত অথচ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সাহায্য প্রদান করতেন না তার তালিকা তৈরীর নির্দেশ দেন । যারা শারীরিক ভাবে সক্ষম তিনি তাদের রাজস্ব ভোগ করার অধিকার দেন । তিনি অভিজাতদের নিজের অনুগত করে রাখার জন্য অসৎ ইক্তাদারদের বিতাড়িত করেছিলেন ।

Compiled and circulated by

Dr. Bhakti Pada Jana

SACT (Grade II), Department of History, Narajole Raj College

আলাউদ্দিন খলজী ও ইক্তা ব্যবস্থা (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি.)

আলাউদ্দিন খলজীর সময় ইক্তা ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন হয় । তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে দিল্লীর কাছাকাছি অঞ্চলকে খলিসা জমিতে পরিণত করে দূরবর্তী অঞ্চলকে ইক্তায় রূপান্তর করেন । তিনি তাঁর সেনাদলকে ইক্তার পরিবর্তে নগদ বেতনের প্রথা চালু করেন । তিনি সেনাপতিদের জন্য ইক্তা বরাদ্দ করেন এবং এর ফলে বুহু জমি খালিসা জমিতে পরিনত হয় । ইক্তার রাজস্বের পরিমান তিনি বেঁধে দেন । দেওয়ান-ই-উজীরত থেকে প্রতি ইক্তার রাজস্বের পরিমাণ স্থির করে দেওয়া হয় । উজীর-ই-শরফ ইক্তার আয় ব্যয় হিসাব পরীক্ষা করতেন । লক্ষ্যনীয় যে যদি কোনো ইক্তাদার গোপনে রাজস্ব কর্মচারীদের আদায় করে তাহলে তাকে দৈহিক শাস্তি প্রদান করা হত ।

গিয়াস উদ্দিন তুঘলক ও ইক্তা ব্যবস্থা (১৩২০-১৩২৩ খ্রি.)

গিয়াস উদ্দিন তুঘলক ইক্তার রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় ক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয় নীতি নিয়েছিলেন, কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, মুক্তিদের উপর বেশী চাপ দিলে কৃষকের উপর চাপ পড়বে । সে কারণে তিনি রাজস্বের পরিমাণ বছরে ১/১০ বেশী বৃদ্ধি করতে দেননি ।

মহম্মদ বিন তুঘলক ও ইক্তা ব্যবস্থা (১৩২৫-১৩৫১ খ্রি.)

মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় ইক্তা ব্যবস্থায় রাজকীয় হস্তক্ষেপ বেশী দেখা যায় । তিনি স্থির করেন যেহেতু তিনি ইক্তাদার দের নগদে বেতন দেন তাই সেনাদলের খরচার জন্য আর ইক্তা দেওয়ার প্রয়োজন নেই । কর আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি ইক্তাব্যবস্থায় ইজারাদারি ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটান । এক্ষেত্রে ইজারাদারদের রাজস্ব আদায় ছাড়া আর কোনো সামরিক কাজ করতে হত না । তারা বেতনভোগী কর্মচারীতে পরিণত হয়ে উঠে । অর্থাৎ দশ হাজার সেনার অফিসার খান থেকে একশো সেনার সিপাহশালার সকলেই নির্দিষ্ট বেতনের পরিবর্তে ইক্তার মালিক হন । অনেক সময় তাদের প্রাপ্য বেতন থেকে তাদের সৈন্যর খরচ মেটাতে হত । একারণে সুলতানের বিরুদ্ধে তাঁর অভিজাত সেনাপতিরা বিশেষ অসন্তুষ্ট হন ।

ফিরোজ তুঘলক ও ইক্তা ব্যবস্থা (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.)

ফিরোজ তুঘলকের সময় থেকে রাজনৈতিক সঙ্কট প্রবল আকার ধারণ করে । তিনি সেনাপতি ও আমীরদের বেতন বাড়ান । বাড়তি বেতনের জন্য খলিসা জমি কেটে আলাদা ইক্তা দেওয়া হয়েছিল । তিনি সেনাদলকেও ইক্তা প্রদান করেন । সেনাদল অনেক সময় ইক্তার রাজস্ব না আদায় করে মোট রাজস্বের ১/২ অংশ অর্থের বিনিময়ে ইজারা দিত । ফিরোজ পূর্বের পদাধিকারীর পুত্রদের সেই পদে নিয়োগের ফলে ইক্তা সম্ভবত বংশানুক্রমিক হয়ে উঠেছিল । সিকন্দর লোদী ও ইক্তাদারের বাড়তি আয়ে ভাগ বসাতেন না । তবে এই সময় থেকে ইক্তার পরিবর্তে সরকার শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে ।

Compiled and circulated by

Dr. Bhakti Pada Jana

SACT (Grade II), Department of History, Narajole Raj College

ইক্তা ব্যবস্থার গুরুত্ব

সুলতানরা ইক্তা বিলির মাধ্যমে শাসক আমীর ও মালিকদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন । খলজী বা তুঘলকের সময় ইক্তাদাররা যেভাবে বেতনভোগী তে পরিণত হয়েছিলেন তা মুঘল পর্বে মনসবদারী প্রথার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে । সুলতান ফিরোজ তুঘলকের সময় যে ভাবে ইক্তাদারী ব্যবস্থায় শিথিলতা এসেছিল তার ফলে সমাজে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা দেখা গিয়েছিল । ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবের মতে, ইক্তা ব্যবস্থা কে কোন সামাজিক বিপ্লব বলা যায় না, বরং এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকের অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল । নিজামী বলেছেন, সুলতান ইলতুৎমিস সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্যে ইক্তা ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন । কখনো কখনো দুর্বল সুলতানদের সময় ইক্তাদাররা ইক্তার উপর বংশনুক্রমিক অধিকার কায়েম করতেন এবং অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কৃষকদের চাপ দিতেন ।

কিন্তু তাসত্ত্বেও বলা যায়, সুলতানি পর্বে ইক্তাদারী ব্যবস্থায় কিছু সুফল দিক ছিল । রাজস্ব নগদে আদায় হওয়ায় মুদ্রা অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ শুরু হয় । গ্রামীন অর্থনীতি সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠে এবং মানুষজন শহরে যাওয়ার ফলে শহরে জনবসতি বাড়তে থাকে । কারিগরি দক্ষতার উন্নতি, বাণিজ্যের প্রসার এবং নগরায়ণ পথ প্রশস্ত হয়েছিল ।

সূত্র :

সতীশ চন্দ্র, মেডিয়াভেল ইন্ডিয়া, হর আনন্দ পাবলিকেশান, নতুন দিল্লী, ২০১২

তেসলীম চৌধুরী, ভারতের ইতিহাস (৬৫০-১৫৫৬), প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলাকাতা, ২০০৯

মাইতি ও মন্ডল, ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (১২০৬-১৭৫৭), শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৮